ভোলার ক্ষুদ্র জেলেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা

মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে জীবিকা সুরক্ষায় ন্যায্য সহায়তা ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টির দাবি

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রায় ৪,৫০,০০০ জন সরাসরি ইলিশ মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত আছেন, যার মধ্যে নিবন্ধিত ও অ-নিবন্ধিত জেলেরা অন্তর্ভুক্ত। এই মাছ ধরা কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেমন মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন, ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ নারী ও পুরুষ জড়িত। এরা প্রত্যেকেই ইলিশ মাছ থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। মাছের প্রজনন রক্ষায় প্রতিবছর সরকার কয়েক দফা নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যা পরিবেশগতভাবে অপরিহার্য ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইতিবাচক। কিন্তু এই সময়টিতে ক্ষুদ্র জেলেরা সম্পূর্ণভাবে আয়ের উৎস হারান। তারা মাছ ধরতে পারেন না, বাজারে যেতে পারেন না, বিকল্প পেশা বা সামাজিক সুরক্ষা নেই। ফলে এই জেলে পরিবারগুলো খাদ্য অনিরাপত্তা, ঋণগ্রস্ততা, সামাজিক মর্যাদাহানি ও পারিবারিক ভাঙনের মুখে পড়ে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের সংগৃহীত তথ্য ও স্থানীয় অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, এই অবস্থানপত্রে ভোলার ক্ষুদ্র জেলেদের বাস্তব চিত্র, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা, এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক নীতির সংযোগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট: বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

২০২৩-২৪ সালে, ৪৭ লাখ হেক্টর জলাশয়ে মাছ আহরণ করা হয়। এর মধ্যে ২৯ লাখ ৭৮ হাজার টন মাছ ছিল চাষের, ১৪ লাখ ১১ হাজার টন মাছ আহৃত হয় উন্মুক্ত জলাশয় থেকে, আর বাকিটা সংগ্রহ করা হয় সমুদ্র থেকে। উন্মুক্ত জলাশয় থেকে আহরিত মাছের অর্ধেকই ইলিশ। জাতীয় মৎস্য নীতি এবং সামুদ্রিক মৎস্য আইন এই খাতকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে এসব নীতিমালা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য নিরাপদ অধিকার, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের “Small-Scale Fisheries Guidelines (SSF-Guidelines)” স্বাক্ষরকারী দেশ, যা ক্ষুদ্র জেলেদের সামাজিক সুরক্ষা, সমঅধিকার ও জীবিকা নিশ্চিতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব জোরদার করার আহবান জানায়। একই সঙ্গে Blue Economy, SDG-14 (“Life Below Water”), এবং NDC-তেও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও জীবিকাগত অভিযোজনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তবে বাস্তবতা বলছে, প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলেও ক্ষুদ্র জেলেদের জীবিকা-সংকট সমাধানের কার্যকর কাঠামো এখনো দুর্বল। WTO এর Fisheries Subsidy Agreement, COP30-এর “Just Transition” নীতিমালা, কিংবা জাতীয় Blue Economy কর্মপরিকল্পনা, সব জায়গাতেই ক্ষুদ্র জেলেরা আলোচনার বাইরে রয়ে গেছেন।

এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলো বিশেষ করে মাছকে ঘিরে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাছ ধরার নৌকাগুলো আশানুরূপ মাছ ধরতে পারছে না। এজন্য তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

পাশাপাশি উপকূল জুড়ে অবৈধ জালের অবাধ ব্যবহার নদী ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি হয়ে উঠছে। দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত উপকূলীয় জেলে পরিবারগুলো বাড়তি আয়ের জন্য এবং ঋণনির্ভরতার কারণে ৩০–৩৫% জেলে পরিবার অবৈধ/নিষিদ্ধ জাল [কারেন্ট জাল, মশারি, প্লাস্টিক জাল, বিন্দি, ঠেলা, খুটা জাল ইত্যাদি] ব্যবহার করছে। কোস্টের ২০২৫ সালের এক গবেষণায় পাওয়া গেছে, ৯৩% জেলেই জানেন যে, এর ফলে নদীর ও সাগরের জীববৈচিত্র্য ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং মাছের উৎপাদন ও প্রজনন প্রক্রিয়া হ্রাস পাচ্ছে। তারপরেও বেঁচে থাকার তাগিদে তাদেরকে এই কাজ করতে হচ্ছে। এই সকল জালে প্রয়োজনীয় মাছ ধরার পাশাপাশি নানান প্রজাতির মাছের পোনা নির্বিচারে মারা যাচ্ছে, মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত শৈবাল, অতিক্ষুদ্র জলজ প্রাণিসহ নানাবিধ প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

শিল্প সম্প্রসারণ/এক্যুয়াকালচার, চিংড়ি চাষ এবং পর্যটনের নামে ভূমি/খাস জমি দখলের কারণে দূষণ বাড়ছে, পলি পড়া, ডুবোচর, যার ফলশ্রুতিতে ইলিশের গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ও নার্সারি আবাসস্থলগুলোর ধ্বংস হচ্ছে। এই ইকো-আবাসস্থলগুলো এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলো জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং প্রাকৃতিক প্রজনন চক্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, যার ফলে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে গত পাঁচ বছরে ইলিশ উৎপাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে; ২০২৩-২৪ সালে যা ছিল সর্বনিম্ন ৫.২৯ লাখ টন।

ক্ষুদ্র জেলেরা প্রায়ই তারা যে মাছ ধরেন, সেগুলো পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাদের কাছে নেই বা তাদের সেখানে এক্সেস নেই। যার ফলে তাদের পণ্যের গুণগত মান এবং লাভ কমে যায়। ফলে তারা স্বল্প মূল্যে জেলেরা মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে তাদের মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হন।

বড় বিষয় হচ্ছে, জাতীয় জিডিপিতে ইলিশের ১% এর বেশি অবদান থাকা সত্ত্বেও, এই মাছ ধরার সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত থাকেন, যেখানে সরকার পরিচালিত মৎস্য নীতি আলোচনায় তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। এর কারণে নীতিমালাগুলি ক্ষুদ্র জেলেদের চাহিদা যেমন নিরাপদ অধিকার, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সংরক্ষণ-এসব বিবেচনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ভোলার জেলে পরিবারগুলোর বাস্তব চিত্র

ভোলা জেলা মোট নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার জন (DoF, ২০২৫)। এর প্রায় ৮১ হাজার জেলে পরিবার এখনও সরকারি সহায়তা পাচ্ছেন না। তবে ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রকৃত ক্ষুদ্র জেলে পরিবারের সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অন্তত ২০,০০০-এর বেশি এখনো সরকারি নিবন্ধনের বাইরে আছেন। শুধুমাত্র ভোলা সদর উপজেলায় প্রকৃত ক্ষুদ্র জেলে পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০ জন। এর মধ্যে মাত্র ৫৫% পরিবার জেলে কার্ডধারী।

কিন্তু বাস্তবে, এই কার্ডধারী জেলেদের মধ্যেও মাত্র ৪৪% নিষেধাজ্ঞাকালীন সরকারি সহায়তা পান। ফলে পুরো জেলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ভোলার ক্ষুদ্র জেলে পরিবারের মোট সহায়তা প্রাপ্তির হার ২৪% নিচে, যা সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে। আবার কোস্টের ২০২৫ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৮৩% জেলে পরিবারের কাছে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার ১-২ মাস পরে সরকারি পরিষেবায় ধার্যকৃত চাল সহায়তা পৌঁছেছে।

পাশাপাশি ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসরত মান্দা সম্প্রদায় মূলত নৌকাভিত্তিক ক্ষুদ্র জেলে জনগোষ্ঠী, যারা ভূমিহীন হয়ে নদীতে ভাসমান জীবনে অভ্যস্ত। এদের অধিকাংশের স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নেই, ফলে তারা নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। সরকার ও এনজিও পর্যায়ে কিছু পুনর্বাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ শুরু হলেও তা এখনো পর্যাপ্ত নয়। এদের টেকসই জীবিকা সুরক্ষা ও নাগরিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা এখন জরুরি।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট

ভোলার ক্ষুদ্র জেলেরা নিষেধাজ্ঞা সময়টিতে এক নীরব দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। উক্ত গবেষণায় ৮৭% পরিবার জানিয়েছেন, তাদের আয়ে "বড় ধরনের পতন" ঘটেছে। গড়ে একজন জেলের মাসিক আয় ১০-১৫ হাজার টাকা থেকে কমে প্রায় শূন্যে নেমে আসে। এই আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে পারিবারিক কলহ, এমনকি নারীর উপর সহিংসতা ৩০%-৪০% পর্যন্ত বেড়ে যায়।

প্রশাসনিক কাঠামো, তালিকার বৈষম্য ও ন্যায্যতার প্রশ্ন

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দুর্বলতাই ক্ষুদ্র জেলেদের অন্যতম প্রধান হতাশার জায়গা। ইউনিয়নভিত্তিক তালিকায় দেখা গেছে, বহু প্রকৃত জেলে বাদ পড়েছেন। এখানে সরকারের সীমাবদ্ধতার কথাও উঠে এসেছে।

২০২৫ সালের এক গণমাধ্যম প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫০% এর বেশি জেলে প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট, তারা মনে করেন, ছোট জেলে নৌকার বিরুদ্ধে অভিযান হয়, কিন্তু বড় ট্রলার বা অবৈধ সিন্ডিকেট প্রভাবশালী হওয়ায় দায়মুক্ত থাকে। ফলে আইন যেমন আছে, ন্যায়বিচার তেমন নেই। তাদের মতে প্রকৃত জেলের তালিকা হালনাগাদ এখনই করা উচিত, না হলে সরকারী তহবিলের বড় অংশ ভুল হাতে চলে যাচ্ছে।

বিকল্প আয়ের অভাব

কোস্টের জরিপ অনুযায়ী, ৮৭% পরিবার কখনো কোনো প্রশিক্ষণ বা আইজিএ উপকরণ পাননি। মাত্র ৫% পরিবার অন্য পেশায় যুক্ত হতে পেরেছেন।

এর ফলে পরিবারগুলো দাদনদারদের ঋণের ফাঁদে পড়ে, আর ঋণ শোধে আবারও দাদনদারদের সাথে জড়িত হয়। এই ঋণনির্ভরতা পরবর্তী মৌসুমে অবৈধ জাল ব্যবহার বা আগাম মাছ বিক্রির চুক্তির দিকে ঠেলে দেয়, যা জেলেদের আত্মনির্ভরতার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। গবেষণায় পাওয়া গেছে, ৬৫% জেলে পরিবার ঋণ শোধে পুনরায় দাদনদারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, ফলে ঋণচক্র আরও শক্তিশালী হয়।

২০২৪ সালে কোস্ট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, ৫৮% জেলে পরিবারের মধ্যে মাত্র একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি রয়েছে এবং অন্যের নৌকায় কাজ করেন এই সংখ্যার মোট ৬৭% জেলে। ফলে ৭০% জেলের সামনেই কোন বিকল্প আয়ের সুযোগ থাকে না। তার মানে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে তাদেরকে আবশ্যিকভাবেই অন্যের উপর নির্ভর করে যেমনঃ দাদনদারদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, পরিবারের ছোট সদস্যদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না পাঠিয়ে আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত করে, এবং মৎস্য আইন লঙ্ঘন করে ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মাছ ধরে তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য আহার জোগাড় করতে হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই অভিযোজনের সংকট

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি এবং মাছ ধরার সময়ের পরিবর্তন। এর ফলে ক্ষুদ্র জেলেরা টেকসই মাছ ধরার এলাকাগুলোর সন্ধানে সমুদ্রের আরও গভীরে যেতে হয়, যা তাদের জ্বালানির খরচ এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি উভয়ই বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় পাওয়া গেছে, জুলাই-আগস্ট ২০২৫-এ ইলিশ ধরার পরিমাণ গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩৩-৪৭% কম।

আমাদের দাবিসমূহ

১. প্রকৃত জেলেদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
২. নিষেধাজ্ঞাকালীন প্রতি মাসে এক জেলে পরিবারকে ন্যূনতম ৮,০০০ টাকা নগদ এবং ৪০ কেজি চাল দিতে হবে।
৩. নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার ১৫ দিন আগে সহায়তা প্রদান করতে হবে; দেরি রোধে ডিজিটাল ট্র্যাকিং চালু করতে হবে।
৪. ক্ষুদ্র জেলেরা যেন সহজে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে লোন বা ক্রেডিটের ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্য যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
৫. বিশেষ করে নারী সদস্য এবং ইয়ুথ সদস্যদের পশুপালন, হস্তশিল্প, ছোট ব্যবসা ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা দিতে হবে।
৬. ঋণনির্ভরতা হ্রাসে প্রণোদনা ও সহায়ক তহবিল গঠন করতে হবে। অর্থাৎ দাদনদার নির্ভর ঋণের বদলে সল্পসুদে সমবায়ভিত্তিক লোন ও গ্রান্ট স্কিম চালু করতে হবে।
৭. নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ জোরদার করতে হবে এবং নিষিদ্ধ জাল তৈরি রোধে কারখানাগুলোতে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে।
৮. Blue Economy, WTO ও COP30 নীতি-নির্ধারণী আলোচনায় ক্ষুদ্র জেলেদের অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের জন্য "Just Transition Fund" স্থাপন করতে হবে।
৯. মান্দা সম্প্রদায়কে (ক্ষুদ্র জেলে জনগোষ্ঠী, যারা নৌকায় বসবাস করে) অতিসত্বর জেলে কার্ডের আওতাভুক্ত করতে হবে।

উপসংহার

ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায় আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা রাষ্ট্রের করের বোঝা নয়, বরং সুনীল অর্থনীতির ভিত্তি। কিন্তু এখনো তারা টেকসই উন্নয়ন ও ন্যায্য অর্থনীতির বাইরে। জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও মাছের প্রজনন অবশ্যই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব; তবে সেই দায়িত্ব তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন জেলেদের জীবনও রক্ষিত থাকবে।

আমরা মনে করি রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, বাজেট ও নীতিগত অগ্রাধিকারে ক্ষুদ্র জেলেদের জন্য ন্যায্য, সময়োপযোগী ও মর্যাদাপূর্ণ সহায়তা কাঠামো প্রণয়ন করা অসম্ভব নয়, এখানে সরকারের স্বদিচ্ছাই যথেষ্ট।

কোস্ট ফাউন্ডেশন, মেট্রো মেলোডি, বাড়ি-১৩, রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ০২ ২২৩৩১৪৭২৯, ০২ ৪১০২৫৮৮৯, ০২ ৪১০২৫৮৯০, ০২ ৪১০২৫৮৯২; ইমেইল: info@coastbd.net, www.coastbd.net